সংবাদ

তারিখ ... 27 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৭

# শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন : বাস্তবায়ন কতদূর

মো. আবুল বাশার ও মোহাম্মদ কবীর হোসেন

একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নাগরিক সৃষ্টি করতে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা। আর মানসম্পন্ন শিক্ষা যে কয়টি উপাদানের ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুগোপযোগী উন্নত শিক্ষাক্রম। বাংলাদেশের মানুষ ১৯৯৫ সালের পর একটি সুসমন্বিত, আধুনিক ও উন্নত শিক্ষাক্রম পেল যা জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ নামে পরিচিত। আসলে শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যই হচ্ছে মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে এ বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাক্রম দলিলে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। এখানে লক্ষ্য হিসেবে যা বলা হয়েছে- 'শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি' (জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ পৃ: ৭)। সন্দেহ নেই একজন শিক্ষার্থী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য যে গুণগুলো প্রয়োজন তার সবই এতে আছে।' বিশেষ করে মানবিক, সামাজিক, নৈতিক, সৃজনশীল ও যুক্তিবাদী গুণগুলো একজন শিক্ষার্থীর মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করে যা দিয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয়। অপরদিকে এ গুণগুলো যদি কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে দিয়ে কল্যাণ সাধিত হয় না বরং রাষ্ট্র ও বাবা-মার কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সকল পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণী কার্যক্রম, মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির প্রবর্তন করতে হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে এরই প্রতিফলন ঘটেছে বলে সর্বমহলে তা প্রশংসিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত পুস্তকগুলো পূর্বের তুলনায় মানের দিক থেকে উন্নত ও একই সঙ্গে শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে রয়েছে শিখনফল, অধ্যায়গুলোকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে, শ্রেণীতে কী কাজ করা হবে তার উল্লেখ রয়েছে, ছোট ছোট পরীক্ষণ ও বাস্তব উদাহরণ রয়েছে। বছরে দুটি পরীক্ষা, মানবণ্টন, পিরিয়ডের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির সুস্পষ্ট নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর বৈশিষ্ট্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সেবার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিতকরণের কথা ২০ নং বৈশিষ্ট্যে বর্ণনা করা হয়েছে (জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ পৃ: ৭)। ১০০ নম্বরের একটি বিষয়ের বেলায় ৮০ নম্বরের সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং ২০ নম্বরের ধারাবাহিক মূল্যায়ন (অর্থাৎ ৮০% সামষ্টিক ২০% ধারাবাহিক মূল্যায়ন) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্যে রয়েছে শ্রেণীর কাজ (নম্বর-১০), বাড়ির কাজ/অনুসন্ধানমূলক কাজ (নম্বর-৫) এবং শ্রেণী অভীক্ষা (নম্বর-৫)। শ্রেণীর কাজ কীভাবে করাবেন, বাড়ির কাজ দৈনিক কয়টি ও কীভাবে দিবেন, অনুসন্ধানমূলক কাজের ধাপ ও বিষয়বস্তু কেমন হবে, শ্রেণী অভীক্ষা কীভাবে নেয়া হবে তার একটি চমৎকার ও সাজানো নির্দেশনা শিক্ষাক্রমে রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ পুরোপুরি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে জানুয়ারি ২০১৩ থেকে এবং এ লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম গত ২ ফেব্রুয়ারি-২০১৩ থেকে আরম্ভ হয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছে। এখনও অনেক জায়গায় বিস্তরণ কার্যক্রম শুরুই হয়নি (যেমন কুমিল্লা অঞ্চল) বলে জানা গেছে। নতুন শিক্ষাক্রম চালু হওয়ার পর আমরা একটি শিক্ষাবর্ষ অতিক্রম করেছি কিন্তু বিদ্যালয়গুলো কি ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে চালু করতে পেরেছে? এ বিষয়ে মতামত জানতে আমরা একদল শিক্ষককে বেছে নিয়েছিলাম। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকায় ডিসেম্বর ২০১৩-তে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলার ৯০টি স্কুলের (৩০x৩=৯০) ৯০ জন শ্রেণী শিক্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন (উল্লেখ্য, এ জেলাগুলোতে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে)। তাদের ওপর একটি সাধারণ জরিপ করে যা পাওয়া যায় তা হলো- ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পর্কে জানেন ও অনুসরণ করেন ৩২ জন (ঢাকা-২১, নারায়ণগঞ্জ-৭, মুন্সীগঞ্জ-৪ জন), ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পর্কে জানেন কিন্তু অনুসরণ করেন না ২২ জন (ঢাকা-৫, নারায়ণগঞ্জ-১১, মুন্সীগঞ্জ-৬ জন), ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পর্কে জানেন না ৩৬ জন (ঢাকা-৪, নারায়ণগঞ্জ-১২, মুন্সীগঞ্জ-২০)। এখানে লক্ষণীয়, ঢাকা জেলার সঙ্গে বাকি দুটি জেলাতে বাস্তবায়ন কার্যক্রমে ভিন্নতা রয়েছে। এ তিনটি জেলা ব্যতীত অন্য জেলাগুলোতে হয়তো ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি আরও উন্নত থাকতে পারে অথবা নাও পারে। তবে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন চালু করা হলো তার সুফল ঘরে তুলতে আরও কাজ করতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়নের আওতায় যে দুটি পরীক্ষার প্রচলন করা হয়েছে তা দিয়ে শিক্ষার্থীর শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানগত দিকই যাচাই করা সম্ভব। এর মাধ্যমে হয়তো পাসের হার ১০০% এ উন্নীত করা যাবে, জিপিএ-৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো যাবে। কিন্তু শিক্ষাক্রম ২০১২-তে যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে তার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য (মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণ, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও দেশপ্রেমিক) অর্জন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক মূল্যায়নের যথাযথ বাস্তবায়ন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনা করে অনেকেই বলে থাকেন ওইসব দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। এর অন্যতম কারণ ওইসব দেশের বিদ্যালয়ে গঠনকালীন/ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতির চর্চা করা হয়। অর্থাৎ একজন শ্রেণী শিক্ষক যখন একজন শিক্ষার্থীকে যাচাই করেন তখন তার বুদ্ধিবৃত্তিক দিকের পাশাপাশি তার সততা, নিষ্ঠা, উপস্থিতি, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা, স্নেহ, অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনায় এনে থাকেন। আমাদের দেশে অনেক দেরিতে হলেও এ বিষয়গুলো ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আনা হয়েছে। আমাদের শিক্ষাক্রম উন্নয়নে যে মডেলটি অনুসরণ করা হয়েছে তার ছয়টি ধাপ রয়েছে। ধাপগুলো হলো- ১. চাহিদা যাচাই, ২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, ৩. শিখনক্ষেত্র, বিষয়কাঠামো ও বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তু নির্বাচন, ৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন, ৫. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন ও ৬. মূল্যায়ন। চাহিদা যাচাই দিয়ে শুরু হওয়া শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ধাপে এসে বাধাপ্রাপ্ত হলো, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন অনেক দূরেই থেকে যাবে। প্রশ্ন হলো, ভালো শিক্ষাক্রম হলে লাভ কি, যদি এটির বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন সুচারুভাবে করা না যায়। সুলিখিত পুস্তক, যথার্থ মূল্যায়ন ব্যবস্থা রেখে কি হবে, যদি শিক্ষক-শিক্ষার্থী এটি পালন না করে। এসইএসডিপি প্রজেক্টের মাধ্যমে শুরু হওয়া বিস্তরণ কার্যক্রম মাঝপথে এসে থেমে গেল, অবশিষ্টদের জানানোর দায়িত্ব কে নেবে? এসইএসডিপি প্রজেক্টের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, প্রকল্প থেকে মাত্র ১৮টি জেলায় বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় আর এগোনো যায়নি। তবে শোনা যাচ্ছে আবার সচল হচ্ছে এসইডিপি প্রজেক্ট। এ প্রজেক্টের নিজস্ব কাজের পাশাপাশি অবশিষ্ট জেলাগুলোতে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। অথচ শিক্ষাক্রম কার্যকর হওয়ার পূর্বেই বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল।

যুগের সঙ্গে তাল মেলানো, বিজ্ঞান শিক্ষাকে উৎসাহিত করা, নৈতিক ও মূল্যবোধের বিষয়, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা সবই স্থান পেয়েছে এ শিক্ষাক্রমে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের শিক্ষাক্রম কার্যকর হওয়ার পর একটি শিক্ষাবর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে আরেকটি শুরু হয়েছে অথচ ৪৬ জেলায় শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম না হওয়াতে সংশ্লিষ্ট জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেকেই সঠিকভাবে জানেনা শিক্ষাক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী, জানেনা কীভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ থেকে উত্তরণের জন্য বিস্তরণ কর্মকাণ্ডের প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবির আরও জোরালো ভূমিকা কাম্য। এতো বড় একটি কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনে মিডিয়ার সাহায্য নেয়া যেতে পারে। দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালানো যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন পরিবর্তিত বিষয় মানতে বাধ্য করতে হবে। ১৮ জেলায় আংশিকভাবে বিস্তরণ কার্যক্রমে সন্তুষ্ট না থেকে ৬৪ জেলার সব শিক্ষককে বিস্তরণ কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক প্রশিক্ষণে কয়েকটি সেসন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কাজের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং উক্ত প্রশিক্ষণে যেসব বিষয়বস্তুতে নতুন শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর চাহিদা রয়েছে সেগুলোতে তা লুকায়িত না রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। সর্বোপরি জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তাকে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের পর তাদের মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রমে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে। বিশেষ করে যেসব বিদ্যালয়ে এক বা একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তারা অন্য সহকর্মীদের মাঝে বিস্তরণ করেছেন কিনা তা গুরুত্বসহকারে সুপারভিশন করার পাশাপাশি কাজটি করতে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহযোগিতা করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিদ্যালয় শিক্ষকরা সহকর্মীর কাছ থেকে শিখতে অনীহা বোধ করেন বা গুরুত্ব দিতে চান না, এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা উচিত। এ ধরনের স্কুলভিত্তিক বিস্তরণ কাজের মূল শক্তি জোগান দেন প্রধান শিক্ষক। তাই প্রধান শিক্ষকদের বিস্তরণ প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরি। বিস্তরণ কাজের একটি সহায়ক উপাদান হচ্ছে শিক্ষাক্রম দলিল। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্তরের শিক্ষাক্রম দলিল সরবরাহ ও তা ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা ভাবতে হবে। আশাহত হওয়ার কারণ নেই, যে কোন পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেই হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনসিটিবি ইতোমধ্যে বড় বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সাফল্য অর্জনের নজির স্থাপন করেছে। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারলেই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বপরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে যথাযথ স্থান করে দেয়া সহজ হবে।